ইউনিট-৫ রাজনৈতিক চেতনা
Political Awareness

ভূমিকা

গ্রীক্ দার্শনিক এরিস্টটল বলেন, ‘মানুষ মাত্রেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীব’। যারা রাষ্ট্রীয় আওতার বাইরে তাদের স্থান মানব সমাজের উপরে বা নীচে।’ মনীষী বেকনও এরিস্টটলের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন, ‘নির্জনতা যারা কামনা করে, তারা হয় দেবতা না হয় পশু।’ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে তাকে কতকগুলো নিয়ম-কানুনদ মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্র সংগঠন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাদি হচ্ছে সুনিয়ন্ত্রিত নিয়ম-কানুনের এক বিশেষ উন্নত প্রকাশ। মানুষের সামাজিক জীবনে যেমনি সামাজিক নিয়ম-কানুন বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ তেমনি তার রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক সচেতনতা (Political Consciousness) সমভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। যে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও সাফল্যের স্বার্থে নাগরিকদের জন্য এর অনুকূলে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা গড়ে তোলা আবশ্যক। এর পরিবতর্তে তাদের মধ্যে যদি প্রতিরোধের মনোভাব বা সক্রিয় বিরোধিতার মানসিকতা থাকে, তাহলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্ব বা সফলতা অর্জন করা যায় না। আর এ রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতনতার উপর। এ কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় রাজনৈতিক চেতনা বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

আসুন এবারে আমরা রাজনৈতিক চেতনা শীর্ষক ইউনিটের পাঠের বিষয়কে নিম্নে উল্লিখিত ৫টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করি:

পাঠ-১ গণতন্ত্র, এর বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ
পাঠ-২ জনমত
পাঠ-৩ নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলী
পাঠ-৪ রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ
পাঠ-৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতি

গণতন্ত্রঃ বৈশিষ্ট্য ও প্রকারভেদ

পাঠ-১

Democracy: Its Characteristics and Classification

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে পারবেন
- গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন, এবং
- গণতন্ত্রের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা (Definition of Democracy)

গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন। অতীত ও মধ্যযুগে গণতন্ত্র মূলত এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আধুনিক যুগে গণতন্ত্র বলতে আমরা কেবল এক ধরনের সরকারকেই বুঝিনা, সাথে সাথে এক ধরনের সমাজ ব্যবস্থাকেও বুঝি। এ ধরনের সমাজব্যবস্থা যেখানে বিরাজমান নেই, সেখানে শাসনপ্রথা গণতন্ত্র নামে পরিচিত হলেও তা'সম্পূর্ণরূপে গণতান্ত্রিক নয়। তবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে গণতন্ত্র বলতে আমরা এক প্রকার শাসন ব্যবস্থাকে বুঝি।

প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (Herodotus) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে বলেছেন, "গণতন্ত্র এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা কোন শ্রেণী বা শ্রেণীসমূহের উপর ন্যস্ত থাকে না, বরং সমাজের সদস্যগণের উপর ন্যস্ত হয় ব্যাপকভাবে।"

এর প্রতিধ্বনি আমরা শুনতে পাই আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ লর্ড ব্রাইসের সংজ্ঞায়। গণতন্ত্র সম্পর্কে লর্ড ব্রাইস বলেন, "যে শাসন প্রথায় জনসমষ্টির অন্তত তিন-চতুর্থাংশ নাগরিকের অধিকাংশের মতে শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তাই গণতন্ত্র। এক্ষেত্রে এটাও উল্লেখযোগ্য যে নাগরিকদের ভোটের শক্তি যেন তাদের শারীরিক বলের সমান হয়" ("A government in which the will of the majority of the qualified citizens' rules .... say, at least three-fourths so that the physical force of the citizens coincides with their voting power"). লর্ড ব্রাইস এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, ঐ শাসনব্যবস্থাই গণতান্ত্রিক, যা' (ক) জনসাধারণের ইচ্ছা, (খ) তাদের মংগলামংগল ও (গ) হিতকর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং (ঘ) যেখানে সাম্য ও স্বাধীনতা প্রাধান্য পায়।

বিয়াট্রীস ওয়েব (Beatrice Webb) ও সিডনি ওয়েব (Sidney Webb) আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে বলেছেন, "কোন নির্দিষ্ট এলাকায় সকল প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসীদের সংঘ যখন রাজনৈতিক আত্মশাসনের ক্ষমতা ও অধিকার ভোগ করে তখন তাকে রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলা হয়।"

স্যার ক্রিপস বলেন, "গণতন্ত্র বলতে আমরা সেই শাসনব্যবস্থাকে বুঝি, যেখানে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সকল বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং সকলের মধ্যে নিজ নিজ মত প্রকাশ করতে পারে।"

ম্যাকইভারের মতে, "গণতান্ত্রিক শাসনে সরকার জনগণের এজেন্ট মাত্র এবং সেই হিসেবে তারা সরকারকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে।"

তবে গণতন্ত্র সম্পর্কে সি এফ স্ট্রং (C F Strong) -এর সংজ্ঞা অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বলেন, "শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত তাকে গণতন্ত্র বলা যায়" ("Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed")।

কিন্তু, গণতন্ত্র সম্পর্কে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের সংজ্ঞাই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, যদিও তা'অধিকতর অস্পষ্ট। তাঁর মতে, 'গণতন্ত্র হল, জনসাধারণের দ্বারা, জনসাধারণের কল্যাণের জন্যে পরিচালিত ও জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা" (Government of the people, by the people and for the people")। প্রেসিডেন্ট লিংকন আরও বলেন, "জনসাধারণের সম্মতি ছাড়া তাদেরকে শাসন করবার অধিকার কারো নেই"। ("No man has a right to govern without other man's consent")।

অনেকে আবার গণতন্ত্রকে একাধারে শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা হিসেবেও বর্ণনা করেন। গণতন্ত্র বলতে অনেকে আবার অর্থনৈতিক সাম্যের কথাও বলেন। শাসনব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বলতে এটাই বুঝায় যে রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর মানুষ সমভাবে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে, আইন পরিষদে সকল শ্রেণীর মতামত প্রতিফলিত হয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নিয়মিত নির্বাচন

প্রতিযোগিতায়, রাজনৈতিক কার্যাবলীতে সকলের অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে উঠা শাসনব্যবস্থাই রাজনৈতিক গণতন্ত্র বলা যায়।

অন্যদিকে সমাজব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র বলতে আমরা সেরূপ সামাজিক পরিবেশকে বুঝি যেখানে তীব্র অসাম্য অনুপস্থিত এবং সমতার ভিত্তিতে সকলে জনকল্যাণকর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করে এবং সকলে সমাজের অপরিহার্য অংশ হিসেবে সুখ-সুবিধার অংশীদার হয়।

আবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে গণতন্ত্র সকলকে সমান সুযোগ দান করে, কাজ করবার অধিকার হতে কেউ বঞ্চিত নয় এবং সর্বোপরি সকলের সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব বোধ না হয়। অনেকের মতে, এই তিন ব্যবস্থা সু-সমন্বিত হলেই কেবল অকৃত্রিম ও অনাবিল গণতন্ত্র সম্ভব।

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics)

গণতন্ত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কিনা তা'এসব বৈশিষ্ট্যের মানদন্ডে বিচার করে সহজেই আমরা অনুধাবন করতে পারি।

প্রথমত, লক্ষ্য করতে হবে উক্ত শাসনব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় কিনা; ***দ্বিতীয়ত,*** নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকারকে পরিবর্তন করা যায় কিনা; ***তৃতীয়ত,*** উক্ত ব্যবস্থায় দল গঠন, মত প্রকাশ ও সমালোচনার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কিনা; ***চতুর্থত,*** জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থরক্ষার সুবন্দোবস্ত রয়েছে কিনা; ***পঞ্চমত,*** উক্ত ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহ আইনগতভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে কিনা; এবং *শেষত,* জনসাধারণ এ আশ্বাস পেয়েছে কি-না যে, সুষ্ঠু বিচার ছাড়া তাদের অহেতুক বন্দীদশা ভোগ করতে হবে না, অথবা অন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। উল্লেখিত ব্যবস্থাসমূহের উপস্থিতি যে-কোন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক করতে সমর্থ।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সলটু (Soltau) বলেন, গণতন্ত্রের মধ্যে চার সত্য অনুধাবনযোগ্য। **প্রথমত,** গণতন্ত্রে প্রত্যেকের স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্মগত অধিকার স্বীকার করা হয়; ***দ্বিতীয়ত,*** গণতন্ত্রের রাষ্ট্রকে কোন অভ্রান্ড় সত্যের প্রতীক বলে গ্রহণ করা হয় না; ***তৃতীয়ত,*** রাজনৈতিক অধিকারে ক্ষেত্রে ও আইনের চোখে সবাই সমান; ***চতুর্থত,*** গণতন্ত্রে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সকলের মতামতের দ্বারা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারে। এ চারটি উপাদানের সুসমন্বয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তা'গণতান্ত্রিক। সুতরাং গণতন্ত্রে মৌলিক কথা হচ্ছে- শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসিতদের সম্মতি লাভ।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ (Classification of Democracy)

আমরা গণতন্ত্রকে নিম্নোক্ত দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি। যথা-

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy) : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার বা শাসনব্যবস্থা গঠন করা হয় তা' হচ্ছে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন এক সরকারকে যেখানে দেশের সকল নাগরিক সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণপূর্বক শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। বর্তমানে রাষ্ট্রের পরিধি ও জনসংখ্যার আকৃতি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বেশ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই বর্তমানকালে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পৃথিবীর খুব একটা বেশি দেশে দেখা যায় না। তবে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি প্রদেশে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

পরোক্ষ গণতন্ত্র (Indirect Democracy) : যে গণতন্ত্রে পরোক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ সরকার নির্বাচন করে তাকে পরোক্ষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলা হয়। অর্থাৎ পরোক্ষ গণতন্ত্র বলতে বোঝায় সেই ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের প্রতিনিধিগণ শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা হয় বিধায় এর অপর নাম প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। এ জাতীয় শাসনব্যবস্থায় জনগণ সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন না করে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিনিধি নির্বাচন করে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ জন্যেই একে পরোক্ষ গণতন্ত্র বলা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি রাষ্ট্রে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

সারকথাঃ

গণতন্ত্র এমন একটি শব্দ যা যুগ যুগ ধরে রাজনৈতিক চিন্তা জগতে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্র কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জনগণের শাসন বা কর্তৃত্ব। গণতন্ত্র এমন এক ধরণের

শাসনব্যবস্থা যে শাসন ক্ষমতা সমাজের সদস্যদের কাছে থাকে। গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছে শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে শাসিতের সম্মতি লাভ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. "শাসিতগণের সক্রিয় সম্মতির উপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাকে বলা হয় গণতন্ত্র।"-উক্তিটি করেছেন-
ক. অধ্যাপক গার্নার
খ. লর্ড ব্রাইস
গ. সি এফ স্ট্রং
ঘ. মিল।

২. গণতন্ত্রের ভিত্তি কি?
ক. একদলীয় শাসন
খ. জনমত ও সাধারণ নির্বাচন
গ. এককেন্দ্রিক শাসন
ঘ. উপরের সবগুলো।

৩. "No man has a right to govern without other man's consent" -উক্তিটি কার?
ক. আব্রাহাম লিংকনের
খ. লাস্কির
গ. অধ্যাপক হল-এর
ঘ. ফাগুয়ের।

৪. গণতন্ত্র হল দু'প্রকার। যথা-
ক. এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয়
খ. একদলীয় ও বহুদলীয়
গ. প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ
ঘ. কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. গণতন্ত্র বলতে কি বুঝেন?
২. গণতন্ত্র (Democracy)-এর ব্যুপত্তিগত অর্থ নিরূপণ করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
২. গণতন্ত্র কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
৩. "গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা"-ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালাঃ ১। গ ২। খ ৩। ক ৪। গ

পাঠ-২

জনমত
Public Opinion

উদ্দেশ্য
এ পাঠ শেষে আপনি -
- জনমত কি তা' বলতে পারবেন
- আধুনিক কালে কি কি উপায়ে জনমত সৃষ্টি হয়ে থাকে তা' বর্ণনা করতে পারবেন, এবং
- আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জনমতের সংজ্ঞা (Definition of Public Opinion)

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে জনমতের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এল ডব্লিউ ডুব (L W Doob) বলেন,"একই সামাজিক সংগঠনের সভ্য হিসেবে জনগণের মতামতই হলো জনমত"।

কিম্বাল ইয়ং (Kimball Young) -এর মতে "একটি নির্দিষ্ট সময়ে জনগণ যে মতামত পোষণ করে তাকেই জনমত বলা হয়"।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লর্ড ব্রাইস (Lord Bryce) -এর মতে "জনসম্প্রদায়ের কল্যাণ সম্পর্কে জনগণের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা হয়"। ("The aggregate of the views men hold regarding matters that affect the interest of the community") ।

অস্টিন রেনী (Austin Ranny) বলেন, "জনমত হল সে সব ব্যক্তিগত মতামতের সমষ্টি যার প্রতি সরকারী কর্মচারীবৃন্দ কিছু পরিমাণে সজাগ থাকে এবং সরকারি কার্যাবলী নির্ধারণের সময় তারা এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে"।

অধ্যাপক লাওয়েল বলেন যে, "জনমত বলে অভিহিত হবার জন্য সমাজের সকলের ঐকমত্য হওয়ার প্রয়োজন হয় না, আবার এর জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত হওয়াই যথেষ্ট নয়"।

সমাজতত্ত্ববিদ মরিস্ জিনস্বার্গ-এর মতে,"সমাজের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল হচ্ছে জনমত"।

প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভি ও কী (V O Key) -এর মতে,"জনমত হল ব্যক্তিবর্গের সে সব মতামত যেগুলোর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা সমীচীন বলে সরকার মনে করে"।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে, সরকার কেবল সে সব মতামতকেই জনমত বলে গ্রহণ করে এবং গুরুত্ব দেয় যেগুলো সুসংগঠিত, সুদৃঢ় ও জনকল্যাণকর। জনমতের পরস্পর বিরোধী সংজ্ঞাগুলো সমন্বয় সাধন করে আমরা জনমতের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দিতে পারি। জনমত হল সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে সুচিন্তিত ও জনহিতকর সেসব সুদৃঢ় মতামত, যেগুলো সরকারকে এবং জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম।

জনমত সংগঠনের বিভিন্ন মাধ্যম (Different Agencies of Public Opinion)

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিম্নলিখিত মাধ্যম বা বাহনসমূহ জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

মুদ্রণযন্ত্র (The Press) : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুদ্রণযন্ত্র জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে । মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা স্বল্পমূল্যে সাধারণ মানুষের জ্ঞান পিপাসা পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ দেশ বিদেশের যাবতীয় সংবাদ অতি সহজেই জানতে পারে। সংবাদপত্র কেবল সংবাদই পরিবেশন করে না, এটি জাতীয়

সমস্যাদির উপর মতামত ব্যক্ত করে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংবাদপত্র দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষাবিদ এবং মনীষীদের প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশ করে জনমত গঠনে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, আচার-অনুষ্ঠান ও বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের মতামত সংবাদপত্রে স্থান পায়। ফলে জনগণের মতামত ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে সরকার অবহিত হতে পারে। সংবাদপত্রের বিরূপ সমালোচনার ভয়ে অনেক সময় সরকারও সংযতভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। তাই গণতন্ত্রে জনমত গঠনে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদপত্রের ভূমিকাকে আমরা কোনমতেই অস্বীকার করতে পারি না।

সভাসমিতি বা বক্তৃতামঞ্চ (The Platform) : সংবাদপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা প্রভৃতি জনমত গঠনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও অশিক্ষিত, নিরক্ষর ব্যক্তির নিকট এগুলোর বিশেষ কোন আবেদন নেই। সেদিক থেকে বিচার করে নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষের মতামত গঠনে সভা সমিতি বা বক্তৃতা মঞ্চের প্রভাব অনেক বেশি বলে মনে করা হয়। গণতন্ত্রে সভা সমিতি করার তথা মতামত প্রচারের স্বাধীনতা স্বীকৃত হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ কিংবা পন্ডিত ব্যক্তিগণ দেশ বিদেশের নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী নিয়ে আলাপ আলোচনা বা বক্তৃতা করেন। এ সমস্যা সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মতামত সভা-সমিতিতে আলোচিত হবার ফলে জনসাধারণ সেসব আলোচনা বা সমালোচনার ভিত্তিতে স্বাধীনভাবেই নিজেদের মতামত গঠন করতে কিংবা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। এদিক থেকে বিচার করে আমরা সভা-সমিতিকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ জনমত সংগঠনের একটি অপরিহার্য মাধ্যম বলে বিবেচনা করতে পারি।

রেডিও, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র (Radio,Television and Cinema) : জনমত সংগঠনে রেডিও, টেলিভিশন ও চলচিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কেবল মাত্র সভা-সমিতির মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণকে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়। বর্তমানে রেডিও,টেলিভিশন ও চলচিত্র প্রভৃতির মাধ্যমে অনেক সহজে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। এগুলোর সাহায্যে শিক্ষিত,স্বল্পশিক্ষিত, কিংবা অশিক্ষিত সব মানুষকেই সহজে প্রভাবিত করা সম্ভব, রেডিও ও টেলিভিশন দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ প্রচারিত হয়। সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং পন্ডিত ব্যক্তিগণ বিস্তারিত আলোচনা করতে পারেন। আবার চলচিত্রের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে জনমত গঠনে এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা লক্ষ্য করে থাকি।

রাজনৈতিক দল (Political Parties) : আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল হচ্ছে জনমত গঠনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধিক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতিটি দল, সংবাদপত্র, সভা-সমিতি, পুস্তক-পুস্তিকা, প্রচারপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে নিজ নিজ দলীয় নীতি ও কর্মসূচী প্রচার করে জনসমর্থন লাভের চেষ্টা করে। সরকারি দল যেমন নিজ সাফল্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রচার করে তেমনি বিরোধী দলগুলো সরকারের ব্যর্থতার বিবরণ দিয়ে সরকারের সমালোচনা করে নিজেদের পক্ষে জনমত সংগঠনের জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবে দলীয় প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জ্ঞান (Political awareness) বৃদ্ধি পায়। তারা পরস্পর বিরোধী মতামত বিচার বিশ্লেষণ করে নিজেরা মতামত গঠন করতে পারে।

আইন সভা (The Legislature) : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দ বিতর্ক, আলোচনা, সমালোচনা, প্রশ্নোত্তর প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, একে অপরের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আইনসভার যাবতীয় আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচারিত হয়। ফলে জনগণ এগুলোর সত্যাসত্য নিরূপণ করে স্বাধীনভাবে মতামত গঠন করতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনমত গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আজকের যারা ছাত্রছাত্রী তাদের অনেকেই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা বা নেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ

করবে। সুতরাং সুশিক্ষা দানের উপর ভবিষ্যৎ দিনের জাতীয় চরিত্র অনেকাংশে নির্ভরশীল । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্ত পরিবেশে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ দেশ-বিদেশের নানা সমস্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। অনেকসময় তাঁরা যুক্তিতর্কের সাহায্যে যে ধ্যানধারণা বা আদর্শকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণ করেন ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই সেই ধ্যানধারণা আদর্শের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই তাদের ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর মধ্যে।

পেশাগত সংঘ (Professional Organizations) : আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে বিভিন্ন পেশাতে নিযুক্ত ব্যক্তিরা নিজেদের পেশাগত দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য নানা প্রকার সংঘ বা ইউনিয়ন গড়ে তোলে। এসব সংঘ বা সংগঠন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কেবল পেশাগত দাবি-দাওয়া পূরণের আন্দোলনের সাথে নিজেদের যুক্ত রাখে। এ সকল সংঘের কার্যকলাপের ফলে মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জনমত সংগঠনের ক্ষেত্রে এসব পেশাগত সংঘগুলির ভূমিকাকে আমরা কোনভাবেই খাটো করে দেখতে পারি না।

ধর্মীয় সংঘ (Religious Organizations) : ধর্মীয় সংঘগুলো জনমত সৃষ্টির ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অনেক ধর্মীয় নেতা সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন এবং রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন। দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে নানা মতামত দিয়ে তাদের ভক্তদের প্রভাবিত করে থাকেন। অ্যালমন্ড এবং পাওয়াল (Almond and Powell) বলেন,"ধর্মীয় সংঘের কার্যকলাপের ফলে মানুষের রাজনৈতিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়"।

নির্বাচন (Elections) : নির্বাচনও জনমত সংগঠনে সহায়তা করে থাকে। দেশের নির্বাচনের সময় প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজ নিজ মনোনীত প্রার্থীকে জয়ী করার জন্যে দেশের সমস্যাগুলোর উপর ভিত্তি করে তাদের বিবৃতির মাধ্যমে জনমত গঠন করে থাকে।

পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদি (Family, Friends etc.) : রাজনৈতিক সামাজিকীরণের (Political socialization) অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে পরিবার। পিতা-মাতার রাজনৈতিক ধ্যানধারণা বা আদর্শের দ্বারা অনেক সময় শিশুমন প্রভাবিত হয়। পরবর্তী জীবনে পরিবার কিংবা পরিজনের এ প্রভাব ব্যক্তির রাজনৈতিক জীবনকে অনেকাংশে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। এছাড়াও বন্ধু-বান্ধব, ক্লাব ইত্যাদি জনমত সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সমাজের সমকালীন সমস্যবলী সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক করে। এর ফলে জনমত সৃষ্টি হতে পারে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, সুষ্ঠু ও শক্তিশালী জনমত সংগঠন ও প্রকাশের জন্যে একদিকে যেমন জনমতের মাধ্যমগুলোর প্রয়োজন, অন্যদিকে তেমনি মতামত গঠন ও প্রকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন। তা'না হলে সুষ্ঠু ও সবল জনমত সংগঠিত ও প্রকাশিত হতে পারবে না।

জনমতের গুরুত্ব (Significance of Public Opinion)

একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমতের গুরুত্ব অপরিসীম। জনমতই গণতন্ত্রের ভিত্তিমূল। সুস্থ, সুসংগঠিত এবং সদাজাগ্রত জনমত গণতন্ত্রের সাফল্যের মূলমন্ত্র। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উৎকর্ষের উপর। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা মূলত জনমতের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জনমতের দ্বারা পরিচালিত। জনমতকে উপেক্ষা করে শাসনকার্য পরিচালনা করা কোন সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। যে দেশে জনমতের প্রভাব যত বেশী সে দেশের শাসনব্যবস্থা ততবেশী গণতান্ত্রিক।

এবারে আমরা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব:

গণতন্ত্রে জনমতই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী : গণতন্ত্রে জনমতই হল সার্বভৌম ক্ষমতার আধার। জনমতের মাধ্যমেই জনসাধারণের বা সমষ্টির কল্যাণকামী ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এ

সমষ্টিগত ইচ্ছাই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। অর্থাৎ জনমতের মধ্যেই সার্বভৌম ক্ষমতা নিহিত থাকে এবং জনমতের মাধ্যমেই তা মূর্ত হয়ে ওঠে।

সরকারকে গতিশীল করে : একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সরকারকে গতিশীল করতে সাহায্য করে। রক্ষণশীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন সরকারি দল অনেক সময় প্রগতিশীল নীতির বিরোধিতা করে থাকে। গণতন্ত্রে প্রবল জনমতের চাপে সরকার তার ঘোষিত নীতি ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়।

জনস্বার্থে আইন প্রণীত হয় : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সকল ব্যক্তির স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ থাকে। ফলে এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সরকার জনমতের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারে। এ অবস্থায় জনস্বার্থে আইন প্রণীত হয় এবং জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না : গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত স্বৈরাচারের পথরুদ্ধ করে। গণতন্ত্রে শাসকবর্গকে জনমতের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এবং জনমতের সাথে সংগতি রক্ষা করে সরকারি নীতি নির্ধারণ ও শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়। জনমতের চাপ ও নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করে কোন সরকারই খেয়াল-খুশিমত আচরণ করতে পারে না।

সরকারের স্থায়িত্ব : জনমতের আনুকূল্য সরকারকে স্থায়ী ও শক্তিশালী করে। জনমতের সমর্থন ছাড়া কোন সরকারই দৃঢ় ও স্থায়ী হতে পারে না।

গণতন্ত্রের স্বার্থে জনমতের সমর্থন দরকার : জনমত গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যে অপরিহার্য। জনমতের বিরুদ্ধে সরকারি কার্যে সাফল্য আশা করা যায় না। প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকার জনমতের অনুগামী হয়। এখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণই শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তারা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের মতামত অনুসারেই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

এ কারণে আমরা বলতে পারি যে,"সজাগ ও তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন জনমত গণতন্ত্রের প্রথম উপদান।" ("An alert and intelligent public opinion is the first essential to democracy")। সমগ্র বিশ্বের রাজনৈতিক কার্যকলাপ পর্যালোচনা করলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সমগ্র বিশ্বই জনমত কর্তৃক শাসিত হচ্ছে ("Public opinion rules the world")। আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এর কার্যাবলীর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক জনমত। সুতরাং আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শক্তিশালী ও সদাজাগ্রত জনমতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনস্বীকার্য।

সারকথা:

জনমত হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণ।তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে 'জনমত পরিচালিত শাসনব্যবস্থা' বলে অভিহিত করা হয়। সাধারণ অর্থে আমরা জনমত বলতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে ও সমস্যাবলীর উপর জাতীয় কল্যাণার্থে জনগণের প্রভাবশালী মতামতের সমষ্টিকে বুঝি। অন্যভাবে বলা যায়, জনমত হচ্ছে জনগণের সঠিক কল্যাণার্থে নিয়োজিত সাধারণের বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ মতামত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. “জনসম্প্রদায়ের কল্যাণ সম্পর্কে জনগণের মতামতের সমষ্টিকে জনমত বলা হয়” -সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন ?
   ক. অস্টিন রেনী
   খ. মরিস্ জিনস্বার্গ
   গ. রবার্ট পীল
   ঘ. লর্ড ব্রাইস।

২. কোন্টি জনমত সংগঠনের মাধ্যম?
   ক. আইনসভা
   খ. পেশাগত সংঘ
   গ. সংবাদপত্র
   ঘ. উপরের সবগুলো।

৩. সর্বপ্রথম ‘জনমত’ কথাটির রাজনৈতিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় -
   ক. রুশোর রচনার মধ্যে
   খ. প্লেটোর রচনার মধ্যে
   গ. জন লকের রচনার মধ্যে
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

৪. “জনমতের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতই যথেষ্ট নয়” - একথা কে বলেছেন ?
   ক. অধ্যাপক লাওয়েল
   খ. মরিস্ জিনস্বার্গ
   গ. এল ডব্লিউ ডুব
   ঘ. ভি ও কী।

৫. "An alert and intelligent public opinion is - to democracy" -এ সংজ্ঞাটির জন্য নিচের কোন্টি সঠিক?
   ক. The first essential
   খ. crucial
   গ. mandatory
   ঘ. subsequent।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. জনমত বলতে কি বুঝেন?
২. “গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনমত সরকারকে গতিশীল করে” - ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. জনমত গঠনের মাধ্যম বা বাহনগুলোর ভূমিকা আলোচনা করুন।
২. আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ক ৫। ক

নির্বাচন ও নির্বাচকমন্ডলী

পাঠ-৩

(Election and the Electorate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার' বলতে কি বুঝায় তা' ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- একটি উত্তম নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করতে পারবেন,
- একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলীর কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

নির্বাচন পদ্ধতি (Modes of Election)

বর্তমান যুগে গণতন্ত্র বলতে পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক (Indirect or Representative) গণতন্ত্রকে বুঝায়। এ ধরনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারে দু'টি পদ্ধতি আমরা উলে- খ করতে পারি। এ পদ্ধতি দু'টি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল:

প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct Election) : প্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটদাতাগণ নিজেরাই সরাসরি নিজেদের প্রতিনিধিকে (Representative) নির্বাচন করে। বর্তমানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যগণ এ পদ্ধতিতেই জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতি খুবই সহজ-সরল। এ পদ্ধতিতে নির্বাচকগণ নির্দিষ্ট ভোটদান কেন্দ্রে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে পছন্দমত একজনকে ভোট দেন। গণনায় সর্বাধিক সংখ্যক ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থী নির্বাচিত হন। বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে এ নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয়।

পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect Election) : পরোক্ষ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন না করে একটি মাধ্যমিক সংস্থা গঠন করে। সেই মাধ্যমিক সংস্থার নির্বাচিত সদস্যগণই চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই মাধ্যমিক সংস্থাটিকে সাধারণত 'নির্বাচক সংস্থা' (Electoral College) বলা হয়। এ ধরনের নির্বাচন পদ্ধতিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোটারদের হাতে থাকে না; থাকে নির্বাচিত সংস্থার সদস্যগণের হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ইলেকটোরাল কলেজের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Suffrage) : গণতন্ত্রে ভোটাধিকার (Voting Right) নাগরিকের একটি অতি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও বটে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। জনগণের এ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের জন্যই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ধারণা জন্মলাভ করেছে। আধুনিক বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। জনসাধারণ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে সরকার ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রেই সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারকে নির্বাচনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যখন দেশের সকল সুস্থ ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন তখন তাকে 'সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার' বলে। এ নীতি অনুসারে কেবল অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাড়া অন্য কোন কারণে জনগণকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় না। তবে উন্মাদ, দেউলিয়া, রাষ্ট্রদ্রোহী, গুরুতর অপরাধে দন্ডিত ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতি ব্যক্তিদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় না।

একটি উত্তম নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of a Good Electoral System)

নির্বাচন যে - কোন রাষ্ট্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ কারণে একটি উত্তম নির্বাচন পদ্ধতি প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিকটই গ্রহণযোগ্য। নিম্নে একটি উত্তম নির্বাচন পদ্ধতির উল্লেখ্যযোগ্য বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল:

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার (Universal Adult Franchise) : রাষ্ট্রের কাজে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন হওয়া উত্তম।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct Election) : রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের জন্য প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি শ্রেয়।

গোপন ভোট (Secret Ballot) : গোপন ভোট গ্রহণ পদ্ধতি নির্বাচনের পবিত্রতা বজায় রাখে। নির্ভয়ে উপযুক্ত প্রার্থীদের পক্ষে গোপন ব্যালেটের মাধ্যমে ভোট প্রদান উত্তম পদ্ধতি।

সহজ ভোট পদ্ধতি (Easy Voting Pattern) : ভোটদান পদ্ধতি যত সহজ হবে নির্বাচন ব্যবস্থা তত উন্নত হবে। জটিল ভোটদান পদ্ধতি স্বাভাবিকভাবেই ভোটারদের নির্বাচন বিমুখ করে তোলে।

একক ও ক্ষুদ্র নির্বাচনী এলাকা (Individual and Small Constituency) : একটি নির্বাচনী এলাকা হতে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়াই উত্তম। এতে ভোটারদের ভোটদান সহজ হয়। তাছাড়া নির্বাচনী এলাকা যত ছোট হয় ততই ভাল। এতে প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে সহজে যোগাযোগ ঘটে।

সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব (Representative of the Minority) : রাষ্ট্রের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের জন্যে সংখ্যালঘু শ্রেণীর উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধান উত্তম নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য।

নির্বাচকমন্ডলী (The Electorate)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচকমন্ডলীই চূড়ান্ত পর্যায়ে সরকারের রূপ ও ধরন নির্ধারণ করে থাকে। নির্বাচকমন্ডলীই ব্যালটের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে বা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে। তাই দক্ষ সরকার গঠন করে সুষ্ঠুভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করার গুরুদায়িত্ব আজ নির্বাচকমন্ডলীর উপর ন্যস্ত। এ কারণেই অনেক লেখক নির্বাচকমন্ডলীকে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ হিসেবে অ্যাখায়িত করেন। গেটেল-এর (Gettell) মতে,"নির্বাচকমন্ডলী কার্যত সরকারের একটি স্বতন্ত্র ও অত্যন্ত প্রভাবশালী শাখা, কারণ এর বিস্তৃত ক্ষমতা রয়েছে এবং তা' সরকারি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রযোজ্য হয়।" এবারে আসা যাক নির্বাচকমন্ডলী বলতে আমরা কি বুঝি।

নির্বাচকমন্ডলীর সংজ্ঞা (Definition of the Electorate)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে থাকে। নির্বাচনে যিনি ভোটদান ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাকে আমরা ভোটার বা নির্বাচক বলি। আর সকল নির্বাচকদের সমষ্টিগতভাবে 'নির্বাচকমন্ডলী' বলে। অর্থাৎ রাষ্ট্রে আইনগতভাবে ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে আমরা 'নির্বাচকমন্ডলী' বলতে পারি।

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নির্বাচকমন্ডলীকে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ডব্লিউ এফ উইলোবি (W F Willoughby)-র মতানুসারে, নির্বাচকমন্ডলী হল, প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার মূল ভিত্তি"। তিনি বলেছেন,"In a pupular government of the repersentative type, the electoral branch may be viewed as the foundation upon which the whole structure of government is erected." নির্বাচকমন্ডলীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অধ্যাপক গার্নার বলেছেন, "নির্বাচকমন্ডলী হচ্ছে নাগরিকের সে অংশ যারা সরকারের গঠন প্রকৃতি ও কার্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার তৈরি করে।"

নির্বাচকমন্ডলীর কার্যাবলী (Functions of the Electorate)

একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমন্ডলীর কার্যাবলী সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা থেকে আমরা একটি স্পষ্ট ধারণা পাব:

প্রতিনিধি নির্বাচন ঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলী ভোট প্রদানের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচন করে সরকার গঠন ও শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। এছাড়া ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে নির্বাচকমন্ডলী এর সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পারে।

নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ : গণউদ্যোগ (Initiative), গণভোট (Plebiscite), গণ নির্দেশ (Referendum) প্রভৃতি পদ্ধতির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচকমন্ডলী আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন, সংশোধন, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করে। পদচ্যুতির (Recall) দ্বারা অনভিপ্রেত সদস্যকে সরিয়ে নিয়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রেও নির্বাচকমন্ডলী সহায়তা করে থাকে।

জনমত গঠন : নির্বাচকমন্ডলী জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ক্ষমতাসীন দলের সিদ্ধান্ত বা বিরোধীদলের বক্তব্য নির্বাচকমন্ডলীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ সকল সিদ্ধান্ত, মতামত ও বক্তব্য পর্যালোচনা করে নির্বাচকমন্ডলী সুষ্ঠু ও সবল জনমত গড়ে তোলে। পত্রিকা, জনসভা ও সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির মাধ্যমে এর প্রকাশ ঘটে। যাঁরা আইন প্রণয়ন করে অথবা যারা নীতি

নির্ধারণের সাথে জড়িত তাঁরাও জনমতের গতি-প্রকৃতি দেখে প্রভাবিত হন। প্রায় অনেক আইন পরিষদে জনমত বাছাই করার ব্যবস্থা রয়েছে। এর মাধ্যমে নির্বাচকমন্ডলী শাসনব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

কোন আইনের প্রতিক্রিয়া যাচাই : অনেক রাষ্ট্রে এটি প্রচলিত রয়েছে যে, কোন আইনের খসড়া তৈরীর পূর্বে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি হবে তা'যাচাই করা হয় নির্বাচকমন্ডলীর মাধ্যমে।

সংবিধান গ্রহণ ও সংশোধন : অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই সংবিধান সংশোধন বা নতুন সংবিধান গ্রহণ করার পূর্বে নির্বাচকমন্ডলীর মতামত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এর ফলে নির্বাচকমন্ডলী দেশের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমার বলতে পারি যে, নির্বাচকমন্ডলীর গুরুত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। অধ্যাপক গার্নার (Garner) বলেন, " নির্বাচকমন্ডলী শুধু সরকারের প্রকৃতি নির্ধারণ ও ক্ষমতা প্রয়োগকারীদের নির্বাচন করে তা নয়, এটা সরকারের একটি অঙ্গে পরিণত হয়েছে।" তাই নির্বাচকমন্ডলী সরকারের অন্য কোন বিভাগ হতে কোন অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সারকথাঃ

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচন হচ্ছে সরকার গঠনের অন্যতম উপায়। বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচনের তাৎপর্য ব্যাপক। 'নির্বাচন' (Election) বলতে আমরা সেই সুযোগকে বুঝি যখন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক বিভিন্ন প্রতিনিধিগণের সপক্ষে অথবা বিপক্ষে তাদের মত প্রকাশ করে থাকে। আর একটু ব্যাখ্যা করে আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনে প্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রক্রিয়াকে নির্বাচন বলে। একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষের মান নির্ভর করে নির্বাচিত প্রার্থীদের গুণগত যোগ্যতার উপর। তাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্যে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। ন্যায্যভাবে ও বিচার-বিবেচনার সংগে ভোটাধিকার ব্যবহারের উপর গণতন্ত্রের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে। এ কারণেই ভোটাধিকারকে আমরা সকল প্রকার রাজনৈতিক অধিকারের মূল উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. নির্বাচনের মূল উদ্দেশ্য কি?
ক. প্রার্থী বাছাই করা
খ. জনগণকে একত্রিত করা
গ. দল নির্ধারণ করা
ঘ. সরকার গঠন করা।

২. প্রত্যক্ষ নির্বাচনের গুণ কোন্‌টি?
ক. রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে
খ. ভোট কারচুপির সম্ভাবনা কম
গ. গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয়
ঘ. উপরের সবগুলোই।

৩. সবচেয়ে উত্তম নির্বাচন পদ্ধতি কোন্‌টি?
ক. সহজ ভোটদান পদ্ধতি
খ. সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার
গ. প্রকাশ্য ভোট
ঘ. প্রত্যক্ষ ভোট।

৪. পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে Electoral College -এর সদস্যদের দ্বারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে থাকে-
ক. ফ্রান্সে
খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
গ. সুইজারল্যান্ডে
ঘ. ক ও খ উভয়ই।

৫. নির্বাচন কত প্রকার?
ক. ৫ প্রকার
খ. ২ প্রকার
গ. ৪ প্রকার
ঘ. ৩ প্রকার।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. নির্বাচন কি?
২. নির্বাচকমন্ডলী বলতে কি বুঝেন?
৩. 'সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার' সম্পর্কে কি জানেন?

রচনামূলক প্রশ্ন
১. একটি উত্তম নির্বাচন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন।
২. নির্বাচন কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা করুন।
৩. একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচকমন্ডলীর কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

উত্তরমালাঃ ১। ক ২। ঘ ৩। ঘ ৪। খ ৫। খ

সহায়ক গ্রন্থঃ
E F Bowman, An Introduction to Political Science, London : Methuen, 1927
অনাদিকুমার মহাপাত্র, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কলিকাতা : সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৪

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ

পাঠ-৪

(Political Socialization)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিতে পারবেন, এবং
- রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মুখ্য মাধ্যমসমূহের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা (Definition of Political Socialization)

রাজনৈতিক দিক থেকে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া হল রাজনৈতিক দীক্ষিতকরণের একটি প্রক্রিয়া। 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ' হল বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহায়ক শিক্ষা গ্রহণের একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার অনুকূল মনোভাব, মূল্যবোধ ও মতাদর্শে একজনকে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করার প্রক্রিয়াই হল 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ'।

অধ্যাপক অ্যালান বল (Alan R Ball) তাঁর 'Modern Politics and Government' শীর্ষক গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ প্রসঙ্গে বলেন, "Political socialization is the establishment and development of attitudes and beliefs about the political system" অর্থাৎ অধ্যাপক বলের মতানুসারে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি মনোভাব ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা ও প্রসারিত করাই হল রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ।

ডেভিড ইস্টন ও জ্যাক ডেনিস (David Easton and Jack Dennis) তাঁদের 'The Child's Image of Government' শীর্ষক রচনায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বলেন, "রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পথ । এই পথে সমাজ তার রাজনৈতিক জ্ঞান, মনোভাব, রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে প্রবাহিত করে।"

অ্যালমন্ড ও পাওয়েল (G A Almond and C B Powell) তাঁদের 'Comparative Politics: A Developmental Approach' শীর্ষক গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ দুই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিমত অনুসারে "রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি বিশেষ পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও পরিবর্তন সাধন সম্ভব হয়। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সাহায্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে সঞ্চারিত করা হয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা হয়। আবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরন বা প্রকৃতির পরিবর্তনও করা যায় রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।"

সিজেল (Roberta Sigel)ও তাঁর 'Assumptions About the Learning of Political Values শীর্ষক রচনায় বলেচেন, "The goal of political socialization is to train or develop individuals that they become well functioning members of the political society.' সিজেল-এর মতে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যমে যে মনোবৃত্তি ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় তা' দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্বাচ্ছন্দ্য ও সাবলীল গতিসম্পন্ন করে তোলে।

এস এল ওয়াসবি (S L Wasby) তাঁর 'Political Science : The Discipline and Its Dimensions' শীর্ষক গ্রন্থে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সর্ম্পকে আলোচনা করেছেন। ওয়াসবির অভিমত অনুসারে "নাগরিকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে বা তাঁর আগে যে পদ্ধতিতে রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে"।

উপরি উক্ত সংজ্ঞাগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ সাপেক্ষে আমরা বলতে পারি যে, রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ হল একটি নিরবিচ্ছিন্ন বা অবিরাম পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিশুর প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পথে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও মনোবৃত্তি জাগ্রত করা যায়। আবার এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্কদের বিভিন্ন রাজনৈতিক ভূমিকার উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মূখ্য মাধ্যমসমূহের ভূমিকা (Role of Major Agencies of Political Socialization)

রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সকল দেশেই বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি দেশবাসীর মনোভাব, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভংগি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। আর এক্ষেত্রে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম বা বাহনগুলো বিশেষ ভুমিকা পালন করে থাকে। রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ব্যাপারে মূখ্য মাধ্যমসমূহের ভূমিকা সর্ম্পকে আমরা নিচের আলোচনা থেকে অবহিত হব।

পরিবার (Family) : রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা প্রাথমিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। পরিবারের পরিমন্ডলের মধ্যেই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সুস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির ভবিষ্যতের অভিপ্রেত ভূমিকার বীজ পারিবারিক পরিবেশের মধ্যেই উপ্ত হয়। ব্যক্তির বিভিন্ন মৌলিক দাবি পূরণের প্রধান উৎস হল পরিবার। পিতামাতার সাথে শিশু নিজেকে একাত্ম করে। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সর্ম্পকে শিশু পিতামাতার দৃষ্টিভংগি ও মূল্যবোধ গ্রহণ করে। এ কারণে ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা হল কেন্দ্রীয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institutions) : রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রম ও কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তের সংগে শিক্ষার্থীদের সর্ম্পক তাদের জীবন ও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক জীবনের অলিখিত রীতি-নীতি সঞ্চারিত করে। শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠ্যক্রমে পৌরবিদ্যা ও প্রশাসন সম্পর্কিত পাঠ্যসূচীও অন্তর্ভুক্ত থাকে যা' শিক্ষার্থীদের মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক মূল্যবোধ ও মতাদর্শ গড়ে তোলে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পেশাগত সংগঠন (Professional Associations): আধুনিকালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন পেশাগত সংঘ (যেমন: শ্রমিক সংঘ, কৃষক সংগঠন, বণিক সংঘ প্রভৃতি) রাজনৈতিক দলের সংগে সংযোগ বজায় রাখে এবং সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা (Patronization) লাভ করে । এর ফলে পেশাগত সংগঠনের সদস্য - সমর্থকদের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ,মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হয়। এভাবে পেশাগত সংঘগুলোও রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে থাকে।

গণ মাধ্যম (Mass Media): আধুনিককালে গণ- সংযোগের মাধ্যমগুলো (সংবাদ পত্র, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি) রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা এবং আনুসংগিক ভাষ্য এসকল গণমাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের নিকট পৌঁছে যায়। এর ফলে রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক বিষয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনার পরিধি প্রসারিত হয়। এর ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে জনসাধারণ আগ্রহী হয়ে উঠে এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রবণতা গড়ে উঠে।

রাজনৈতিক দল (Political Party): রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি রাজনৈতিক দল তাদের সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচি দ্বারা জনগণকে রাজনৈতিক বিষয়াদি, ধ্যান-ধারণা, সমস্যা ও অভিজ্ঞতার সাথে পরিচিত করে। এর ফলে রাজনৈতিক বিষয়ে জনগণের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়, সচেতনতা সম্প্রসারিত হয় এবং বুদ্ধিগত বিকাশ ঘটে। আবার রাজনৈতিক দল জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্মে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং এ অংশগ্রহণের সূত্রে জনগণের মধ্যে আনুগত্যের সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক সামাজিকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যাপক অ্যালান বল বলেন, “Political parties are more diffuse because of their need to win wider support."

অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী (Peer Group): সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের গোষ্ঠীই হল অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী। আধুনিক সমাজে এ ধরনের অন্তরঙ্গ গোষ্ঠী ব্যক্তি মানুষের রাজনৈতিক জীবনকে প্রভাবিত করে এবং রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধবের রাজনীতি বিষয়ক মনোভাব ও মতামত সমবয়স্কদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রভাবিত করে। গোষ্ঠীগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্য ব্যক্তিরা অংশীদার হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও মিথস্ক্রিয়ার (Action and interaction) সৃষ্টি হয়, তা' রাজনৈতিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ধর্মীয় সংগঠন (Religious Organizations): বস্তুত মানব সমাজে ধর্মের ভূমিকা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও আচার-অনুষ্ঠানসমূহ ব্যক্তি মানুষের জীবনধারা প্রভাবিত করে ভীষণভাবে। তাই রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান তথা ধর্মীয় সংগঠনের ভূমিকাকে অস্বীকার করা য়ায় না।

সারকথা:

যে-কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও সাফল্যের স্বার্থে নাগরিকদের মধ্যে এর অনুকূলে মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও চিন্তাধারা গড়ে তোলা আবশ্যক। এর পরিবর্তে নাগরিকদের মধ্যে যদি প্রতিরোধের মনোভাব বা সক্রিয় বিরোধিতার মানসিকতা থাকে, তাহলে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার দীর্ঘস্থায়িত্ব বা সফলতা আশা করা যায় না। আর এ রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের উপর। এ কারণেই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় 'রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ' বিষয়টির উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সামাজিকীকরণ হল শিক্ষা গ্রহণের একটি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া।

মূলত মানুষের সামাজিক প্রকৃতির উন্মেষের উপায়কে বলা হয় সামজিকীকরণ। অর্থাৎ সামাজিকীকরণ হল এমন এটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি মানুষের সামাজিক প্রকৃতির বিকাশ সাধন সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. "নাগরিকরা বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে বা তার আগে যে পদ্ধতিতে রাজনৈতিক মূল্যবোধ অর্জন করে তাকে রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ বলে।" রাজনৈতিক সামাজিকীকরণ সম্পর্কে এ সংজ্ঞাটি কে দিয়েছেন?
ক. ডেভিড ইস্টন
খ. এস এল ওয়াসবি
গ. জে সি জোহারি
ঘ. সি বি পাওয়েল।

২. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মাধ্যম নিচের কোন্‌টি?
ক. অন্তরঙ্গগোষ্ঠী
খ. পরিবার
গ. গণমাধ্যম
ঘ. উপরের সবগুলো।

৩. "Political parties are more diffuse because of their need to win___." রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের জন্যে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা প্রসংগে বলের এ বক্তব্যের জন্য কোন্‌টি সঠিক?
ক. Wider support
খ. Leadership
গ. People's consent
ঘ. উপরের কোনটিই নয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. সামাজিকীকরণ বলতে কি বুঝেন?
২. রাজনৈতিক সামজিকীকরণের ক্ষেত্রে পরিবারের ভূমিকা সম্পর্কে। সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন
১. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের সংজ্ঞা দিন।
২. রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের মূখ্য মাধ্যমসমূহের ভূমিকা র্বণনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। খ ২। ঘ ৩। ক

সহায়ক গ্রন্থঃ
Finkle and Gable (eds.), Political Development and Social Change, NewYork : John Wiley and Sons, Inc., 1966
L W Pye and S Verba (eds.), The Civic Culture, Boston : Little, Brown and Co., 1965
সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম, সামাজিক পরিবর্তন ও রাজনৈতিক উন্নয়ন, ঢাকাঃ বুক সোসাইটি, ১৯৯০

রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture)

পাঠ-৫

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি তা' বলতে পারবেন
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাস করতে পারবেন,
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির সংজ্ঞা (Definition of Political Culture)

'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' সম্পর্কিত ধারণার প্রথম প্রবক্তা হলেন জি এ অ্যালমন্ড (G A Almond)। তাঁর মতে,রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে "কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতির প্রতি মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিকৃতি" ("The pattern of individual attitudes and orientations toward politics shared by members of a political system")।

সিডনি ভারবার (Sidney Verba) মতে, "পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক এবং মূল্যবোধের সমষ্টিই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে।"

লুসিয়ান পাই (Lucian W Pye) এর মতে, "রাজনৈতিক সংস্কৃতি হচ্ছে ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস ও অনুভূতির এমন এক সমষ্টি যা' রাজনৈতিক কার্যাবলীকে অর্থপূর্ণ করে তোলে এবং এদের মধ্যে এক প্রকার সুশৃঙ্খল অভিব্যক্তি ঘটায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেই এদের অন্তর্নিহিত ও মনস্তাত্ত্বিক দিকের সার্বিক প্রকাশ ঘটে।"

এলান বল (Alan R Ball) বলেন যে,"রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমাজের সে সকল মনোভাব, আবেগ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত হয়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থার ও রাজনৈতিক প্রশ্নাদির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ সকল মনোভাব সচেতনভাবে পোষণ নাও করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সম্পর্কের ভিতর অন্তর্নিহিত থাকেতে পারে" ("A political culture is composed of the attitudes, beliefs, emotions and values of society that relate to the political system and to political issues. These attitudes may not be consciously held, but may be implicit in an individual and group relationship with the political system".)।

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে আমরা বলতে পারি যে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি' বলতে এমন কতকগুলো মনোভাব, বিশ্বাস ও অনুভূতিকে বুঝায় যা' কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শৃংখলা ও তাৎপর্য দান করে এবং যা' রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার মূল্যবোধ ও বিধি-বিধান সৃষ্টি করে। কোন রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ভাবধারা ও রীতি-নীতি সবকিছুই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাস (Classification of Political Culture)

অ্যালমন্ড ও ভারবা (G A Almond and S Verba) তাঁদের 'The Civic Culture' শীর্ষক গ্রন্থে একটি সমাজে তিন প্রকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির উলে- খ করেছেন। নিচের আলোচনা থেকে এ তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্কে আমরা জনার চেষ্টা করব।

সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture): সাধারণত অনুন্নত দেশগুলোতে এবং সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে জনসাধারণের মধ্যে চেতনা ও আগ্রহের অভাব বা ব্যাপক উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয় সেখানে এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিরাজ করে। রাজনৈতিক জীবনধারা ও জাতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জনগণের প্রবল অনীহার কারণে সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের ব্যাপারেও সচেতনতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। সংকীর্ণতাবাদী

রাজনৈতিক সংস্কৃতি অবসানের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার ব্যাপক বিস্ড়ার ও রাজনৈতিক যোগাযোগ (Political communication)।

অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture): এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে প্রত্যেক নাগরিক রাজনৈতিক বিষয়ে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ব্যক্তিমাত্রই নিজেকে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে মনে করে। প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও মূল্যায়ন (Participation and evaluation) এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে অতি গুরুত্বপূর্ণ। অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নাগরিক মাত্রই তার অধিকার, কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্পর্কে সদা সচেতন থাকে।

নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture): এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে জনগণের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ নয়। এখানে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে এবং তাদের জীবনধারার উপর রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনসাধারণ নিষ্ক্রিয় থাকে। রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে উৎসাহ থাকলেও এখানে জনগণ সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা করে না। বরং সরকারের অধিকাংশ সিদ্ধান্তকেই বিনা প্রতিরোধে কর্তৃত্ব সম্পন্ন বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। এ ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে আইন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা এসকল ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায় না।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত উপরিউক্ত তত্ত্বগত বিচার-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও একথা বলা দরকার যে, কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই কোন বিশেষ শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি বর্তমান থাকে না। প্রত্যেক রাজনৈতিক সংস্কৃতিই হল আসলে মিশ্র সংস্কৃতি (Mixed Culture)। নাগরিক সংস্কৃতি (Civic Culture) গঠিত হয় রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশুদ্ধ তিনটি শ্রেণীর সংমিশ্রণের মাধ্যমে। বিশুদ্ধ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই দেখা যায় না।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব (Importance of Political Culture)

যে-কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা থেকে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতি (Political process) সুশৃংখল ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। দেশের রাজনৈতিক পদ্ধতিকে সুশৃংখল ও অর্থবহ করে তোলার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এছাড়া যে সকল নিয়মনীতি রাজনৈতিক অনুমানের দ্বারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় তাও রাজনৈতিক সংস্কৃতি থেকে উৎসারিত হয়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে লুসিয়ান পাই (Lucian W Pye) বলেন, "It encompasses both the political ideals and the operating norms of a polity" অর্থাৎ রাজনৈতিক আদর্শ ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি-রীতি রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংগীভূত থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্যক্তিভিত্তিক ও সমষ্টিভিত্তিক বিচার বিশে- ষণের মধ্যে সংযোগ সাধন করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনের সম্ভাবনা ও তার প্রকৃতি পরিধি ও প্রক্রিয়া অনুধাবন করা যায়। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও আচার-আচরণের মধ্যে যুক্তিসংগত ও অযৌক্তিক বিভিন্ন বিষয় বা উপাদান থাকে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার-বিশে- ষণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ভূমিকা সম্যকভাবে বুঝা যায়। বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ থেকে তাদের সচেতনতা ও সক্রিয়তার মান অনুধাবন করা যায়। মূলত ব্যক্তিগোষ্ঠী ও সমগ্র সমাজের রাজনৈতিক সচেতনার মাত্রা রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

স্বাধীনতাপ্রাপ্ত উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিচার বিশ্লেষণ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ সকল অনগ্রসর দেশে বিদ্যমান রাজনীতির প্রতি দেশবাসীর মনোভাব, মূল্যবোধ, বিশ্বাস রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যদি প্রতিকূল হয়, তাহলে সেসকল দেশে বিকাশজনিত সমস্যা দেখা দেয়। জাতি, ধর্ম, ভাষা, উপজাতি ও গোষ্ঠীগত বিচার-বিবেচনার প্রাধান্য জাতিগত স্বার্থ বিকাশের বিষয়টিকে করে তোলে গুরুত্বহীন। দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্যের অভাব দেখা দেয়। দেশও দেশবাসীর সামগ্রিক উন্নতি

বাধাপ্রাপ্ত হয়। সত্তার স্বাতন্ত্র্যের প্রেক্ষিতে অনগ্রসর দেশগুলোতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা বিতর্কের উর্ধ্বে।

সারকথা:
যে কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক, সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি জাতির রাজনৈতিক মূল্যবোধ বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির পরিচয় মিলে সে জাতির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। মানুষের সামাজিক জীবনে যেমনি সামাজিক সংস্কৃতি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তার রাজনৈতিক জীবনেও রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য

পাঠোত্তর মূল্যায়ন
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন
সঠিক উত্তরটি লিখুন।

১. ‘রাজনৈতিক সংস্কৃতি’ সম্পর্কিত ধারণার প্রথম প্রবক্তা হলেন-
ক. জি এ অ্যালমন্ড
খ. সিডনি ভারবা
গ. অ্যালান বল
ঘ. লুসিয়ান পাই।

২. “পরীক্ষালব্ধ বিশ্বাস, প্রকাশযোগ্য প্রতীক ও মূল্যবোধের সমিষ্টই হচ্ছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি যা’ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের পরিধি ব্যাখ্যা করে।” সংজ্ঞাটি কার?
ক. লুসিয়ার পাই- এর
খ. সিডনি ভারবার
গ. জে সি জোহারির
ঘ. সি বি পাওয়েল-এর।

৩. The Civic Culture গ্রন্থটি যৌথভাবে রচনা করেছেন-
ক. অ্যালমন্ড ও কোলম্যান
খ. অ্যালমন্ড ও ভারবা
গ. হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল ও ডেভিড ট্রুম্যান
ঘ. মাইরন ওয়েনার ও স্যামুয়েল পি হান্টিংটন।

৪. G A Almond I S Verba তাঁদের রচনায় একটি সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণত কয় শ্রেণীর রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন?
ক. চার শ্রেণীর
খ. তিন শ্রেণীর
গ. পাঁচ শ্রেণীর
ঘ. দুই শ্রেণী।

৫. জনসাধারণের মধ্যে চেতনা ও আগ্রহের অভাব বা ব্যাপক উদাসীনতা সাধারণত লক্ষ্য করা যায় কোন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে?
ক. মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে
খ. সংকীর্ণতাবাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে
গ. নিষ্ক্রিয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে
ঘ. উপরের সবগুলোতেই।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন
১. রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কি বুঝেন?
২.একটি সমাজে বিদ্যমান ‘অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক সংস্কৃতি’র প্রকৃতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন
১. “যে-কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর ও ঘনিষ্ঠ।” - এ উক্তির আলোকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব তুলে ধরুন।
২. একটি সমাজে বিদ্যমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি কত প্রকারের ও কি কি? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ১। ক ২। খ ৩। খ ৪। খ ৫। খ